থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE

An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013-20

Title: রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশীগান: বঙ্গভঙ্গ [*Rabindranath o Swadeshi Gaan: Banga-Bhanga*]

Author(s): Priyanka Gope

Published: 23 December 2020

রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশীগান: বঙ্গভঙ্গ © 2020 by Priyanka Gope is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Yr. 08, Issue 15-16, 2020

Autumn Edition
September-October

thespian.articles@gmail.com | www.thespianmagazine.com

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

Editorial Board

Chief Editor
Professor Abhijit Sen
Professor (retired), Department of English
Visva-Bharati, Santiniketan

Editor of
Autumn Edition 2020
Ahmed Ahsanuzaman, PhD
Professor
Department of English
Independent University, Dhaka, Bangladesh
(On lien from Khulna University, Bangladesh)

Managing Editor
Bivash Bishnu Chowdhury
PhD Research Scholar, Department of English
Visva-Bharati, Santiniketan

Associate Editors
Dr. Arnab Chatterjee
Assistant Professor in English,
Harishchandrapur College, Maldah, West Bengal

Tanmoy Putatunda
Assistant Professor of English,
School of Liberal Studies
Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University
Bhubaneswar, Odisha

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

Peer-Review Committee of Autumn Edition'20

Editor of
Autumn Edition 2020
Ahmed Ahsanuzaman, PhD
Professor
Department of English
Independent University, Dhaka, Bangladesh
(On lien from Khulna University, Bangladesh)

- ⇒ Dr. Sarmila Acharif, Assistant Professor, Department of French, Pondicherry University, Puducherry, India.
- ⇒ Debmalya Das, Achhruram Memorial College, Purulia Ranchi Road, Jhalda, Purulia, West Bengal, India.
- ⇒ Dr. Tapan Kumar Bagchi, Deputy Director (Research), Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh.
- ⇒ Stuti Mamen, Assistant Professor, Department of English, Bhasha Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan, West Bengal, India.
- ⇒ Dr. Swati Roy Chowdhury, Assistant Professor of English, Mankar College, Burdwan, West Bengal, India.
- ⇒ Dr. Joly Puthussery, Associate Professor, Centre for Folk Culture Studies, School of Social Sciences, University of Hyderabad, India.
- ⇒ Dr. Chandana Kumar Vemana, Assistant Professor (Senior), School of Media & Communication, Manipal University, Jaipur, Rajasthan, India.
- ⇒ Tariq Manzoor, Assistant Professor, Department of Bengali, University of Dhaka, Dhaka, Bangladesh.
- ⇒ Tanmoy Putatunda, Assistant Professor of English, School of Liberal Studies, KIIT University, Bhubaneswar, Odisha, India.

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশীগান: বঙ্গভঙ্গ

Dr. Priyanka Gope, Assistant Professor, Department of Music, University of Dhaka, Dhaka, Bangladesh

অবিভক্ত বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সকল গান রচিত হয়েছে সেগুলো 'স্বদেশী গান' হিসেবে প্রচলিত। এই গানগুলো দেশাত্মবোধক পর্যায়ের হলেও এগুলো রচনার পটভূমি ছিল স্বদেশী আন্দোলন। ফলে এই গানগুলোকে দেশাত্মবোধক গান বললেও ভুল হবে না। এই ধরনের গানে দেশমাতৃকার জয়গান, অন্তরের জড়তা দূর করে প্রকৃত দেশপ্রেমকে উজ্জীবিত করা, আত্মসমর্থন, আত্মনির্ভরশীলতা, মাঠপর্যায়ের আন্দোলনকারীদের উদ্দীপিত ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলা, শোষন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয় প্রভৃতি বিষয়বস্তু মূল প্রতিপাদ্য। যেমন:

"তোমারি তরে মা, সঁপিনু দেহ।

তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।

তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,

এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।" (রায় ৪৯)

অর্থাৎ দেশের প্রতি সমস্ত মন প্রাণ সপে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। দেশের দুঃখে মন যেমন কাঁদে, তেমনি দেশোদ্ধারে মন জাগ্রত হয়। শত-সহস্র জাগ্রত কণ্ঠ দেশের স্বনির্ভরতার জন্য ডেকে উঠতে পারে। উদাহরণ:

"ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পমানুরাশি

যত দিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি তত দিন তুই কাঁদ রে।" (রায় ৫১)

এবং

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,

এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন

বন্দে মাতরাম্।" (রায় ৫৪)

যেহেতু এই গানগুলোর প্রেক্ষাপট 'বঙ্গভঙ্গ' সেহেতু এই গানগুলোকে 'স্বদেশী গান' বলাই যথোপযুক্ত। স্বদেশীদের সমর্থনে

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

শিল্পীদের একাত্মতা প্রকাশ পেয়েছে এইসব গানের মাধ্যমে। স্বদেশী আন্দোলনে মূলত বাংলার শিক্ষিত ও আধুনিকবোধসম্পন্ন তরুণদের নেতৃত্ব ও সমর্থন করতে দেখা যায়। বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে তৎকালীন অধিকাংশ কবি, সাহিত্যিক, গীতিকবিরা তাঁদের অবস্থান সুস্পষ্ট করেছেন বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে। বাহুবল কিংবা অস্ত্রশক্তিই কেবল অন্যায় প্রতিহত করে তা নয়, কলমের শক্তি এবং কণ্ঠশক্তিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ফলে বাঙালি গীতিকবি ও শিল্পীদের লেখনী ও কণ্ঠ দিগ্বিদিক বিস্তৃত হয়েছে দেশমাতৃকার জয়গানে। বঙ্গভঙ্গ কালীন ও ইংরেজ পরাধীনতার বিপক্ষে বাঙালি গীতিকবিরা অধিক সোচ্চার ছিলেন তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে। ফলে সে সময়কার রচিত গান বাংলাগানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

অবিভক্ত বাংলায় দেশাত্মবোধ বা চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় সিপাহী বিদ্রোহ অর্থাৎ ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৬৪ সালের আগে বাংলা ভাষায় দেশমাতৃকার বন্দনা সম্বলিত কোন কবিতা বা গান খুব কম পাওয়া যায়। ১৮৫৮ সালে কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে *পদ্মিনী* উপাখ্যানে 'স্বাধীনতা-হীনতা' শীর্ষক কবিতা সংযুক্ত করেন; যেখানে তিনি দাসত্ব, পরাধীনতার বিপক্ষে শক্তিশালী আওয়াজ তুলেছেন, এমনকি দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনে শহীদ হওয়াকে অতুলনীয় বলেছেন। সেসময় বেশ আলোড়ন তোলে কবিতাটি। তাঁর মৃত্যুর পর বঙ্গভঙ্গের সময় আরো একবার স্বদেশীদের কাছে নতুন প্রাণ পায় এ কবিতাটি। এছাড়া দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) রচিত নাটক *নীল দর্পন* (১৮৫৮-১৮৫৯)-এর প্রতিপাদ্যও স্বাদেশিকতা, বিশেষ করে নীলচাষীদের প্রতি অবর্ণনীয় শোষন- নিপীড়নের বিরুদ্ধে (নীল বিদ্রোহ) সোচ্চার আত্তয়াজ তুলেছেন, যা সাধারণ জনগনকে প্রত্যক্ষ সাহস জুগিয়েছে, যদিও এটি বঙ্গভঙ্গের বহু আগে রচিত। তা সত্ত্বেও শিল্প সাহিত্যের এইসব অসামান্য রচনা পরবর্তীকালে স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপনা যুগিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসন, সামাজিক চেতনা ও পরাধীনতাবোধ সম্বন্ধে বাঙালির সচেতনতাই স্বদেশপ্রেমের অন্যতম কারণ। তবে তাদের দৈনন্দিন কাজে কর্মে, চাকরীতে, লেখনীতে সরাসরি দেশপ্রেম নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা কমই দেখা যেত। পত্র-পত্রিকায় বৃটিশবিরোধী কিছু কিছু লেখা চোখে পড়লেও সাধারণ মানুষের ভাবনায় সেই অর্থে গুরুত্ব পেত না। সেসময় কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে সাধারণ জনগনের কাছে প্রকৃত সাহস যোগাতে সক্ষম হন। বিশেষ করে যখন লর্ড কার্জন সরাসরি বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেন, তখন তাঁদের ভেতরকার আগুনের স্ফুলিঙ্গ দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। আসলে অনেকেরই মনে মনে বৃটিশদের বিরুদ্ধে অগ্নুৎপাত হলেও বঙ্গভঙ্গ একটা বড় এবং অবশ্যম্ভাবী উপলক্ষ্য হয়ে উঠেছিল দেশের প্রতি প্রেমকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশের জন্য। একদিকে স্বাধীনতা যেমন স্বাধীনতাকামীর জন্য ব্যাপক আত্মানন্দস্বরূপ শোষক শ্রেণি অধীনতা স্বীকার করানোতে আত্মতৃপ্ত হয়। মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) স্বাধীনতাকামী মানুষের কষ্ট অন্তরে অনুধাবন করে পরোক্ষভাবে তাঁর একটি রচনার অংশে (১৮৮৫) বলছেন- "স্বাধীনতা – কি মধুমাখা কথা! স্বাধীন জীবন কি আনন্দময়! স্বাধীন দেশ কি আরামের স্থান! স্বাধীন ভাবের কথাগুলি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের সূক্ষশিরা পর্য্যন্ত আনন্দোচ্ছাসে স্ফীত হইয়া উঠে এবং অন্তরে বিবিধ ভাবের উদয় হয়। হয় মহাহর্ষে মন নাচিতে থাকে, না হয় মহাদু:খে অন্তর ফাটিয়া যায়" (হোসেন ২০৮)। এই ছোট্ট অংশটুকু অনেক গভীর অর্থ বহন করে। যদিও এটি একটি ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত, তথাপি এর মূল বিষয়ে স্বাধীনতা একটি বড় স্থান

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

দখল করে আছে। তাঁর ভেতরকার স্বদেশপ্রেম আর স্বচ্ছ রাজনৈতিক চেতনা স্পষ্টতই এই লেখনিতে পাওয়া যায়। সেই সময় এই শক্তিশালী লেখনিও হয়তো কোন না কোনভাবে বাংলার মানুষের মনে স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গকে জাগ্রত করতে বিশেষ উদ্দীপনা জুগিয়েছিল।

'উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলায় স্বদেশ চেতনায় যে ভাব ক্রমশ দীপ্ত হয়ে উঠেছিল তার অন্যতম কেন্দ্র ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়িতে স্বদেশিকতার প্রতি আগ্রহ জন্মে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ থেকে। যদিও অনেকেই ভাবেন রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ঠাকুরবাড়ির কেউই সরাসরি ইংরেজদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেননি। কিন্তু সরাসরি পদক্ষেপ না নিলেও হিন্দুমেলার প্রধান সহায় ঠাকুর পরিবার' (রায় ১১)। তার সত্যতা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি*গ্রন্থে বাল্যস্মৃতিচারণে। তিনি বলছেন, "স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে রাখিয়াছিল" (ঠাকুর ৩৪৮)।

ধরা হয়, স্বদেশপ্রেমের বীজ বপন হয় ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা স্থাপনের মধ্য দিয়ে, যার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র। যদিও নামকরণের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার একটা আভাস পাওয়া যায়। তথাপি হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে লেখা গান, কবিতার অধিকাংশই স্বদেশ কেন্দ্রিক। স্বদেশকে গুরুত্ব দিয়ে সেসকল গান, কবিতা রচিত হয়েছিল। মেলায় স্বদেশীয় শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও ক্রীড়া চর্চা ও এগুলোর উন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হতো। "...হিন্দুমেলার মূল উদ্দেশ্য- জাতীয় চরিত্রে আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মসম্মান জাগরণ এবং স্বাবলম্বী প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করা।" (মুখোপাধ্যায় ৪৬) পরবর্তীকালে এই নামকরণ নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়, হিন্দুমেলা না হয়ে অন্য নামকরণও হতে পারত। কিন্তু তখনকার প্রেক্ষাপটে এই নামকরণই হয়তো যথোপযুক্ত মনে করেছেন প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর সহায়ক সভ্যগণ। কেননা, বৃটিশরা বিভক্তির মূল কারণ হিসেবে পূর্বের মুসলমান এবং পশ্চিমের হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহ আরও কিছু কারণ দেখিয়েছিলেন এবং পশ্চিমের অধিকাংশ হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে "হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্গবাণী পত্রিকায় বলেন- সেকালে এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতির এ দেশের উপর দাবী-দাওয়া আছে ইহা শিক্ষিত সমাজের মনে উদয় হয় নাই।" (মুখোপাধ্যায় ৪৭) যদিও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বাদেশিক ভাবনায় কেবল হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুদের ছিল না। সবার সমান অধিকার ছিল। এর ফলে বৃটিশদের ভাবনার সাথে তাঁর পুরোপুরি বিভেদ হয়েছে এমনটা অনেকেই মনে করেন না। তবে স্বদেশী আন্দোলনের মূল স্ফূলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল হিন্দুমেলা থেকেই। যার পথিকৃৎ ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রথম স্বদেশ সঙ্গীত হিসেবে হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় রচিত ও কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় সুরারোপিত 'ভারতসঙ্গীত' গীতিকবিতাটিকে ধরা

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

হয়। এই গানটিকে স্বদেশি গান বললেও ভুল হবে না। “গীতিকবিতাটি ১৮৭২ সালে ‘এডুকেশন গেজেট’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।” (Web Source)

ভারতসঙ্গীত

রাগ: ইমন-বেলাবলী

তাল: ঢিমে তেতালা।

“বাজরে শিঙা বাজ এই রবে সবাই স্বাধীন বিপুলভাবে

সবাই জাগ্রত মনের গৌরবে, ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।

আরব মিশর পারস্য তরকী, তাতার তিব্বত অন্য কবকি

চীনা জাপান অসভ্য আফগান, তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,

দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান, ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।

এখন জাগিয়া উঠিবে সবে, এখন সৌভাগ্য উদয় হবে,

রবিকর সম দ্বিগুণ প্রভাবে, ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে।

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য-শূদ্র মিলে

করি দৃঢ় পণ এ মহিম-লে উড়াও আপনার মহিমা ধ্বজা।।

এই গানে স্বদেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনা ক’রে পরাধীনতার গ্লানি ও লজ্জা প্রথম কয়েকটি স্তবকে বর্ণিত হয়েছে। কবিতার শেষে, ভারত যে পুনরায় নিজের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হবে সে আশাও ব্যক্ত করা হয়েছে।” (সেনগুপ্ত ৮৪)

এছাড়া গোবিন্দচন্দ্রের ‘কতকাল পরে বল ভারত রে’ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মিলে সবে ভারত সন্তান’ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিশোর ছিলেন; তা সত্ত্বেও স্বাদেশিকতার ছোঁয়া তাঁর সাহিত্য ও কাব্য চর্চায় পড়ে। “সঞ্জীবনী সভা উপলক্ষে রচিত তাঁর গান ‘এক সূত্রে বাঁধা আছি’ একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।” (ঘোষ ১০৬) তবে সেসময় রচিত গানগুলোকে *রবীন্দ্র সঙ্গীত*গ্রন্থে অপটু রচনা বলে মত দেন শ্রী শান্তিদেব ঘোষ। কেননা তখন রবীন্দ্রনাথের যৌবনের প্রারম্ভকাল ছিল। পরবর্তীকালে প্রকাশিত গানের বই-তে গানগুলো লিপিবদ্ধ হিসেবে পাওয়া যায় না, যা শান্তিদেব ঘোষের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করে। *জীবনস্মৃতি*

থেসপিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলার কথা উল্লেখ করেন এবং মেলাকে কেন্দ্র করে বেশকিছু স্মৃতি রোমন্থন করেন। "১৮৭৬ সালে হিন্দু মেলার উদ্যোগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুনেন্দ্রনাথ, গোবিন্দ চন্দ্র রায় -প্রমুখ ব্যক্তিদের লেখা এবং 'ভারতমাতা', 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', 'সরোজিনী', 'নীলদর্পন' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত উনত্রিশটি জাতীয় সঙ্গীত সংকলিত হয়েছিল।" (সেনগুপ্ত ৮৩-৮৪)

এই মেলার প্রথম অধিবেশনে কোন গান গাওয়া হয়েছিল কি না, সে কথা জানা যায় না। তবে দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারতসন্তান' গানটি উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়। একথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রসঙ্গক্রমে *জীবনস্মৃতি*গ্রন্থে বলেছেন। এরপর থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বাংলায় স্বদেশপ্রেমের গান বিকশিত হতে থাকে। বাংলায় দেশাত্মবোধক গানের মূল প্রেরণা ছিল রাজনৈতিক। রাজনৈতিক নিপীড়ন সাধারণ মানুষের মনে পরাধীনতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। কোন দেশ শোষক বা শাসকদের একার নয়, সাধারণ জনগণেরও। অর্থাৎ সামাজিক মুক্তির অধিকার থেকেই সাধারণ মানুষ বিভিন্নভাবে তাদের দাবী ও দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে; যার মধ্যে কবিতা, সাহিত্য ও গান অন্যতম। দেখা গেছে শিল্পীরা সবসময় সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলেন, যে কারণে দেশাত্ববোধসম্পন্ন সংগীত, সাহিত্য, পদ্য প্রভৃতি সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে; যা আজও প্রাসঙ্গিক। সিপাহী বিদ্রোহ, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন গান রচিত হয়েছে, যেগুলো দেশাত্মবোধক বলে পরিচিত হলেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে উদ্দেশ্য করে যে সকল গান রচিত হয়েছে সেগুলো 'স্বদেশী গান' বলে বিবেচিত হয়েছে। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সেসময় অনেকেই স্বদেশী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গান রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০ খ্রিস্টাব্দ), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) এবং সমসাময়িক অনেক গীতিকবি ও সুরস্রষ্টা যেমন: মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪১-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ), প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭৩-১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ), বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ), সরলাদেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রমুখ স্বদেশপ্রেমের গান রচনা করেছেন। এই গানগুলো স্বদেশীদের পক্ষে এক বিশেষ শক্তি জুগিয়েছে। গানের বাণী ও সুরের মধ্যে তাঁরা নতুন করে স্বাধীনভাবে বাঁচার অনুপ্রেরণা খুঁজে পেতো। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সেই হিন্দু মেলা ও সঞ্জীবনী সভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে স্বদেশিকতার বীজ তাঁর ভেতরে রোপিত হয়েছে, যদিও তখন তিনি বেশ ছোট (মাত্র ১৩ বছর ৮ মাস)। আত্মবোধের স্বদেশী সঙ্গীত রচনার মাধ্যমে দেশপ্রেমিকদের অন্তরের শক্তি প্রকাশ্যে আনতে প্রতিনিয়ত উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। স্বদেশী আন্দলনে কেবল গান লিখেই নন, সভা-সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করে, পত্রিকা-ম্যাগাজিনে স্বাদেশীকতার পক্ষে লিখে, উঁচু পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন। যা সমসাময়িক অন্যান্য গীতিকবি থেকে তাঁকে আলাদা করেছে। স্বদেশী গানের প্রেক্ষাপট এক হলেও বিভিন্ন কবির প্রকাশের ধরনে ভিন্নতা ছিল, সুর প্রয়োগেও ছিল বৈচিত্র্যময়তা। তবে এই প্রবন্ধের পর্যালোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত স্বদেশী গান; অর্থাৎ ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

রবীন্দ্রনাথের গান। "বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানকে স্বদেশী গান হিসেবে প্রথম সুপ্রচলিত করেন গুরুদেব। ১২৯২ সালে 'দেশ' রাগিণীতে এটিতে সুর যোজনা করেছিলেন। ...বর্তমান ভারতীয় কংগ্রেসে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের যে অংশটি গাওয়া হয়, গুরুদেব কেবলমাত্র সেই অংশটিতেই সুরযোজনা করেছিলেন।" (ঘোষ ১০৭) যদিও 'মল্লার' রাগে ও 'কাওয়ালি' তালে বঙ্কিমচন্দ্র সুরারোপিত 'বন্দে মাতরম্' কথা জানা যায়, তবে সে সুর গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এখন সে সুর আর পাওয়াও যায় না। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেশ' রাগে সুরারোপিত 'বন্দে মাত্রম'-এ ভক্তি ও আবেগ ভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে, যা খুব সহজেই সাধারণ থেকে বিশেষ সকল শ্রেণির মানুষের হৃদয়ে গ্রথিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের তিনটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট ধরা যায়। বঙ্গভঙ্গ পূর্ববর্তী, বঙ্গভঙ্গকালীন এবং বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী সাধারণ দেশভক্তির গান। আলপনা রায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলোকে সুরভেদ ও প্রকাশকাল অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করেছেন। তাঁর মতে এই তিনটি বিভাগ নিম্নে দেয়া হল-

"১) হিন্দুমেলা থেকে প্রাক্-বঙ্গভঙ্গ পর্বের গান (১২৮৪-১৩০৯)- ২৫ টি গান

২) বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ পর্বের গান (১৩১২)- ২৭টি গান

৩) উত্তরপর্বের গান (১৩১৬-১৩৪৪)- ১৩টি গান।" (রায় ১৩)

প্রথম ভাগের গানগুলো অধিকাংশই জাতীয় সংগীত পর্যায়ের, যাতে তীব্র জাতীয়তাবোধ পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গভঙ্গকালীন এর প্রতিবাদস্বরূপ যেসব গান রচনা করেন তাতেও জাতীয়তাবোধ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। বাংলাদেশের প্রতি ভালবাসা, পরাধীনতার গ্লানি, আত্মনির্ভরতা, ভারতবর্ষের গৌরবগাথা, স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করা এবং সর্বপরি অখণ্ড ভারত ভাবনা; এই সমস্ত কিছুই তাঁর কলমে ও অন্তরের সুরঝঙ্কারে উঠে এসেছে। প্রাক-বঙ্গভঙ্গের গানে আবেগের চেয়ে বেদনাই বেশি প্রস্ফুট হয়েছে। এমনকি বৃটিশবিরোধী বিদ্রোহের সুরও পাওয়া যায়। সেই লেখনীতে কেবল আত্মগ্লানি উঠে এসেছে বারবার। *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় ১২৯১ সালে (১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত গানগুলিতে এ বিষয়ের প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন:

"এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি!

বুঝি পিতা, তারে ছেড়ে গেছ তুমি।

প্রতি পলেপলে ডুবে রসাতলে-কে তারে উদ্ধার করিবে।

... নহিলে আঁধারে বিপদ পাথারে কাহার চরণ ধরিবে।" (রায় ৫৬)

এবং

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

"শোন শোন আমাদের ব্যথা দেব দেব প্রভূ দয়াময়

আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয়" (রায় ৫৮)

এই গানগুলো 'জাতীয় সঙ্গীত' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু ব্রহ্মসঙ্গীতও রয়েছে। এসময় তিনি *ভারতী* পত্রিকায় লেখেন- "ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারিনা। আর, তাহাই যদি না পাই তবে আসল জিনিসটাই পাইলাম না। কারণ, ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী।" (রায় ১৪) এই পর্বের গানগুলির সুরে ভারতীয় রাগরাগিণী প্রাধান্য পেয়েছে। তারমধ্যে কয়েকটি গান যেমন- 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে', 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক', 'খ্যাপা তুই, আছিস আপন খেয়াল ধরে' প্রভৃতিতে রামপ্রসাদী, কীর্তনাঙ্গ ও বাউল সুর লক্ষ্য করা যায়।

এরপর তাঁর বোধ ধীরে ধীরে জাতীয়তাবোধের ক্ষুদ্রতা থেকে বিশ্ববোধের দিকে ধাবিত হয়। ফলে উত্তরপর্বের গানে কোথাও স্বাদেশিকতার বার্তা দেখা যায় না। যেমন- 'হে মোর চিত্ত পূণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে'। গান ও কবিতায় বিশ্বপ্রাণ স্পন্দিত হতে দেখা যায়। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠাকরণে তিনি নিজেকে সঁপে দেন। তাঁর কার্যকলাপে এটি স্পষ্ট যে, এই সমস্যা শুধু ভারতবর্ষ বা বাংলার একার নয়, এটি বিশ্বেরও সমস্যা। বিশ্ব নেতৃবৃন্দেরও এই সমস্যায় এগিয়ে আসা উচিত। বিশ্বের যেকোন স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সবার এক হয়ে কাজ করা উচিত। ফলে বঙ্গভঙ্গ উত্তরপর্বে জাতীয়তাবোধের গান নয় বরং বিশ্বচেতনাবোধের গান শেষ অবধি তিনি রচনা করে গেছেন।

এবারে বঙ্গভঙ্গকালীন রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক। প্রথম পর্বের স্বদেশী গানের তুলনায় দ্বিতীয় পর্বের অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ কালীন সময়ের গানে তুলনামূলক পরিণত ভাবনার ছাপ পড়ে। এই পর্বের অধিকাংশ গানে আত্মদীক্ষায় দীক্ষিত হওয়ার সুর পাওয়া যায়। "ভারত ভাবনার বিমূর্ত আবেশ, আবেগ-উচ্ছ্বাস ঘেরা স্বপ্নময় জগত থেকে কবি নেমে এসেছেন ভালবাসার প্রাণের মাটিতে, গভীর হয়েছে তাঁর স্বদেশ বোধ... ১৯০৫-০৬ খ্রিস্টাব্দ তাঁর দেশাত্ববোধক গান রচনার শ্রেষ্ঠ সময়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে রচিত হয়েছে একগুচ্ছ গান। যার সূচনা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' রচনায়, সমাপ্তি 'এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা হাতে হাত ধর গো' গানে।" (রায় ১৬-১৭) স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ রচিত গান সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য- "এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে' গানটি শুনিয়া, তরী ভাসাইব কি, গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে।" (ঘোষ ১০৮)। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে আত্মবোধের প্রতিফলন প্রকটভাবে লক্ষণীয়। আত্মশক্তি, আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস তাঁর স্বদেশ ভাবনার ভিত্তি। "কথা-সুরের নিবিড়তায় তাঁর স্বদেশী গানে বিশেষত বঙ্গভঙ্গ প্রতিবাদের গানে, বাঙালি পেয়েছে নিজস্ব অনুভবের ভাষা।" (রায় ১৫)। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে' -এই গানটি আত্মশক্তির এক অনন্য উদাহরণ। এই পর্বের একদিকে যেমন দেশমাতৃকাকে নিয়ে ভালবাসার গান রয়েছে তেমনি ওপর দিকে রয়েছে প্রতিবাদের গান। এছাড়াও রয়েছে আত্মবোধদীপ্ত গান। তবে সবগুলো গানেরই ভাষা সহজ, তাল ও সুর সরল ও স্বচ্ছন্দ। গানের কিছু কিছু অংশে লোকজ শব্দের

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

প্রয়োগ থাকলেও তাতে আঞ্চলিকতার সংস্পর্শ নেই। যেমন- 'ভয় যে জাগে শিয়র বাগে' কিংবা 'নেব গো মেগে-পেতে' প্রভৃতি ভাষার ব্যবহারে এই গানগুলো কেবল ব্যক্তিবিশেষে নয়, সমগ্র জাতির কণ্ঠ হয়ে উঠেছে। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দেশাত্ববোধক কবিতা ও গানের সঙ্কলন গ্রন্থ *স্বদেশ*। "*স্বদেশ*-এর 'বাউল' পর্যায়ের সব গানের সুর বাউলাঙ্গ না হলেও, এ পর্যায় থেকে বাউল গ্রন্থের উদ্ভব।" (রায় ২১)

জাতীয়তাবোধ, বাঙ্গালিত্ব, দেশ প্রেমিক সমস্তটা মিলেমিশে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান, উচ্চ-নীচ জাত ভেদ ছিল না। তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাখি বন্ধন উৎসব। "দর্পিত ইংরেজ শাসকের বঙ্গভূমি দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাবিত দিনটি (১৬ অক্টোবর ১৯০৫, ১৩১২ আশ্বিন ৩০) রাখি বন্ধনের উৎসবে পরিণত করলেন বাংলার ভাবুক দল, যাঁদের পুরোধা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।" (রায় ২২) রাখি উৎসবের আগে 'বিজয়া সম্মিলন'-এর ভাষণেও অসাম্প্রদায়িক আত্মজাগরণের সুর শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। সম্মিলনের শেষে তার প্রকাশ ঘটে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটির মাধ্যমে। সর্বসাধারণকে এক করার লক্ষ্যে এই গান তিনি রচনা করে, যার সুরে রয়েছে বাংলার নিজস্ব সুর। "এই সময়ে (১৯০৫-০৮) প্রকাশিত হয়েছে বাংলা দেশাত্মগানের সর্বাধিক সঙ্কলন; মাতৃ পুজা, জাতীয় উচ্ছ্বাস, জাতীয় রাখি সঙ্গীত, বন্দে মাতরাম, স্বদেশ সঙ্গীত, স্বদেশী সঙ্গীত, বন্দনা; এর প্রায় প্রতিটিতেই ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের প্রাধান্য।... অবিভক্ত দুই বঙ্গে তখন স্বদেশী মিছিল বা শোভা যাত্রায় অপরিহার্য ছিল রবীন্দ্রনাথের গান।" (রায় ২৫)

গীতবিতানে রবীন্দ্রনাথের গানের যে ছয়টি পর্যায়ভাগ আছে, তার মধ্যে স্বদেশ পর্যায়ের মোট ৪৬টি গান রয়েছে। এর মধ্যে ২৩টি গান স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত, বাকিগুলো দেশাত্মবোধক, জাতীয়সংগীত ও ভারতসংগীত। ৪৬ নং স্বরবিতানে নিবদ্ধ গানগুলো প্রধানত স্বদেশী আন্দোলনের সমকালীন গান এবং ৪৭ নং স্বরবিতানে নিবদ্ধ গানগুলো ভারতসংগীত ও স্বদেশভক্তির গান হিসেবে উল্লিখিত আছে। তবে ১৯০৫ সালে রচিত ও প্রকাশিত গান বিবেচনা করলে ৪৬ নং স্বরবিতানের ২৪টি গানের মধ্যে ২২টি গান ও ৪৭ নং স্বরবিতানের ২৬টি গানের মধ্যে ১টি গানকে স্বদেশী গান বলে চিহ্নিত করা যায়। গানগুলো নিম্নে ছক আকারে দেয়া হলো-

১)	স্বরবিতান ৪৬	আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
২)	স্বরবিতান ৪৬	আপনি অবশ হলি তবে
৩)	স্বরবিতান ৪৬	আমরা পথে পথে যাব সারে সারে
৪)	স্বরবিতান ৪৬	আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
৫)	স্বরবিতান ৪৬	আমি ভয় করব না ভয় করব না

৬) স্বরবিতান ৪৬ এখন আর দেরি নয়

৭) স্বরবিতান ৪৬ এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে

৮) স্বরবিতান ৪৬ ও আমার দেশের মাটি

৯) স্বরবিতান ৪৬ ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে

১০) স্বরবিতান ৪৬ ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর

১১) স্বরবিতান ৪৬ তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে

১২) স্বরবিতান ৪৬ তোরা নেই বা কথা বললি

১৩) স্বরবিতান ৪৬ নিশিদিন ভরসা রাখিস

১৪) স্বরবিতান ৪৬ বাংলার মাটি বাংলার জল

১৫) স্বরবিতান ৪৬ বিধির বাঁধন কাটবে তুমি

১৬) স্বরবিতান ৪৬ বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি

১৭) স্বরবিতান ৪৬ মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর

১৮) স্বরবিতান ৪৬ যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

১৯) স্বরবিতান ৪৬ যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না

২০) স্বরবিতান ৪৬ যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক

২১) স্বরবিতান ৪৬ যে তোরে পাগল বলে

২২) স্বরবিতান ৪৬ সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে

২৩) স্বরবিতান ৪৭ আমাদের যাত্রা হল শুরু

উপরোক্ত গানগুলো সুরবৈচিত্র্যে অনন্য। এর মধ্যে অধিকাংশ গানই বাউল অঙ্গের, ঢপ-কীর্তনের সুরও রয়েছে, আবার ভাঙা গানও রয়েছে। তাঁর লোকসুরাশ্রিত পর্যায়ের অধিকাংশ গানই বঙ্গভঙ্গকালীন। এই সময় থেকেই কবি দেশীয় সুরের (রামপ্রসাদী, বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালী, সারি প্রভৃতি) প্রতি আকৃষ্ট হন। যদিও এর আগেও কীর্তন সুরের গান তিনি রচনা করেছেন। দেশীয় চেতনার সাথে

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

দেশীয় সুরের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন ঘটান। তিনি জানতেন, যে গান সর্বসাধারণের জন্য রচিত তার সুরও সাধারণের বোধের মধ্যে হওয়াই শ্রেয়। এই সময়কার গানগুলো তীব্র আবেগের প্রেরণায় উৎসারিত এক একটি শব্দাস্ত্র। যদিও *বাউল* পুস্তকের সব গান বাউলাঙ্গের নয়। এই গানগুলোর বাণীতে বিভিন্ন প্রসঙ্গ উঠে এসেছে; যেমন: বাংলার সৌন্দর্যবর্ণনা, দেশবন্দনা, তেজোদৃপ্ত বা সংগ্রামী প্রভৃতি। আজ হয়তো এই গানগুলোর পটভূমি অনেকেই ভুলে গেছে, তবে সুর ও বাণীর চিরন্তন আবহ এর পটভূমি খুঁজতে প্রতিনিয়ত উৎসাহ জোগায়।

এবারে মূল গান-ভাঙা গানের প্রসঙ্গে আসা যাক। 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাউল সুরের গান। গানটির প্রেক্ষাপট হল- বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ৭ই আগস্ট ১৯০৫ সালে কলকাতার টাউন হলে এক সভা হয়, সেই সভা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গান রচনা করেন। বাউল গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে' গানটির সুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানে বসিয়েছেন। গানটির প্রথম ১০ লাইন পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি পায়। 'এবার তোর মরা গাঙে' গানটিতে বিখ্যাত সারি গান 'মন মাঝি সামাল সামাল' গানটির সুর বসানো হয়েছে। তাই এই গানকে লোকসুরের গান বলা হয়। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানকে অনেকে বাউল অঙ্গের বললেও আসলে এটি ঢপ-কীর্তন ''হরি নাম দিয়ে জগত মাতালে' গানটির ভাঙা সুর। 'যদি তোর ভাবনা' গানটিও বাউল গান 'ও রাজা'-এর ভাঙা গান। 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক' গানটি বাউল ও কীর্তন সুরের মিশ্রন, এটিও 'চিরদিন এমনিভাবে' গানটির ভাঙা গান। 'যে তোরে পাগল বলে' গানটি বাউল ভাবাশ্রিত কথার হলেও সুর ভাওয়াইয়া; 'আমার এই দেহতরী কি দিয়ে বানালে গুরুধন' গানটির সুর এই গানে ব্যবহার করা হয়েছে। 'ও আমার দেশের মাটি' গানে 'সোনার গৌর কেনে' বিখ্যাত বাউল গানটির সুর ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এটিও বাউল অঙ্গের গান। মূলগান-ভাঙাগান ছাড়া বাকী যে গানগুলো লোকসুরের আশ্রয়ে রচিত সেগুলোর মধ্যে রাখিসংগীত অন্যতম। 'বিধির বাঁধন কাটবে' এবং 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হোক' গান দুটিও রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষে রচিত। এছাড়া 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে, 'আপনি অবশ হলি তবে', 'আমরা পথে পথে যাব সারে সারে', 'আমি ভয় করব না ভয় করব না', 'ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর', 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে', 'ওরে তোরা নেইবা কথা বললি', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি', 'মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর' প্রভৃতি গানগুলোও বাউল সুরের। 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গানটি টপ্পা অঙ্গের। বাংলায় নিধুবাবুর টপ্পায় যে ধরণের অলঙ্কার প্রযুক্ত হয়, সেরকম মোটা দানার অলঙ্কার এই গানেও ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকে এই গানকেও বাউলাঙ্গের গান বলে থাকেন।

তালের ক্ষেত্রে দেখা যায় লেখা আছে একতালা, কিন্তু পরিবেশনার সময় তা কিছুটা কীর্তনাঙ্গীয় ঢংয়ে কিংবা বাউলাঙ্গীয় ঢংয়ে ৩/৩ ছন্দে বাদিত হচ্ছে। তবে এতে গানের পক্ষে ভালো হয়েছে; ছন্দবিভাগ এক হওয়ায় বাউলাঙ্গের গানগুলো তুলনামূলকভাবে আরও প্রাণবন্ত শোনায়। 'আমার সোনার বাংলা', 'ও আমার দেশের মাটি', 'আমি ভয় করব না', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক', 'যে তোরে পাগল বলে', 'আপনি অবশ হলি', 'মা কি তুই

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

পরের দ্বারে’, ‘তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে’, ‘ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে’, ‘বিধির বাঁধন কাটবে তুমি’ প্রভৃতি গানের তাল পরিবর্তিত হয়েছে বারো মাত্রা থেকে ছ-মাত্রায়, ত্রিমাত্রিক একতাল থেকে দাদরায়।

তবে উপরোক্ত গানগুলো পড়লে বা শুনলে একটি কথাই মনে বাজে, তা হল- গানের বাণীতে ভালোবাসা বা আত্মপ্রত্যয় বা প্রতিবাদ যাই থাকুক না কেন, গানস্থিত ভাষা অধিক অলঙ্কারভূষিত নয়, সহজ ছন্দ এবং সুরেও রয়েছে স্বচ্ছন্দ চলন; যা খুব সহজে অন্তরে গ্রথিত হয়। গানগুলো এমনভাবে বাঁধা মনে হয়, এ শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের মনের ভাবনার প্রকাশ নয়, সমগ্র দেশকালের অন্তরের কথা। “বঙ্গভঙ্গ-পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের কুড়িটি স্বদেশী গান, যার অনেকগুলি মুদ্রিত হয়েছিল সঞ্জীবনী, ভাণ্ডার, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায়।” (রায় ২১)

সেদিন ভাবোচ্ছাসের সংগীত বাঙালির জীবনে যে নবচেতনা এনেছিল, তা এ যুগের তরুণদের প্রতিনিয়ত উদ্দীপনা যুগিয়ে যাচ্ছে। স্বদেশীগান সেসময় আন্দোলনকারীদের উদ্দীপনা জুগিয়েছে, আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। তাঁদের প্রেরণার মূল রসদ হিসেবেও কাজ করেছে। গানগুলো রাষ্ট্রীয় আত্মচেতনাকে দ্রুত ভারতব্যাপী ছড়িয়ে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বঙ্গভঙ্গকালীন রচিত এই গানগুলো শুনলে সেসময়ে স্বদেশীদের চেতনা অনুধাবন করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বোচ্চ সংখ্যক গান রয়েছে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে।

“তাঁর স্বদেশী গানের প্রথম পর্বের শেষ রচনা ‘জননীর দ্বারে আজি ঐ শুন গো শঙ্খ বাজে’ আর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্বের শেষ প্রকাশিত গান ‘এখন আর দেরি নয় ধর গো তোরা হাতে হাতে’র ভাবগত ভিন্নতা স্বত্ত্বেও দুই গানের ‘পূজা’ কোনও ভিন্ন পূজা নয়, দুই গানেই আরাধ্যা সেই দেশমাত্রিকা, ভারত আর বাংলা যেখানে এক অচ্ছিন্ন অন্তরঙ্গ সূত্রে মিলে গেছে।” (রায় ২৬)

আজকের প্রেক্ষাপটে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন ঘটনায় এর মধ্যে বেশ কয়েকটি গান এখনও প্রাসঙ্গিক এবং বিভিন্ন দিবসে বিশেষ কিছু গান আজও গাওয়া হয়। স্বদেশী গানের অনুপ্রেরণা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন রচিত গানগুলোর মধ্যেও পাওয়া যায়। এই অনুপ্রেরণা কেবল সুরের বা কাব্যের নয়, বোধের। বাংলাদেশের গীতিকবিরা, সুরকাররা মুক্তিযুদ্ধকালীন যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সবই মুক্তিসেনাদের প্রতিমুহূর্তে উজ্জীবিত করেছে। আন্দোলনের মাঠে না গিয়েও স্বদেশীভাবনায় নিজের মত প্রকাশ করার সাহস ও লেখনী দিয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করার অগ্রপথিক কবিগুরু। বঙ্গভঙ্গ প্রেক্ষাপটে রচিত রবীন্দ্রনাথের গানগুলো স্বদেশ ভাবনায় সংগীতকে যুক্ত করার এক দৃষ্টান্ত রেখেছেন যা তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী অনেক গীতিকবিই অনুসরণ করেছেন। এই গানের মাধ্যমে বাঙালি জাতি তাদের দেশাত্ববোধকে ভিন্নভাবে ও শক্তিশালীরূপে সমগ্র জাতি তথা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

তথ্যসূত্র

ঘোষ, শান্তিদেব। *রবীন্দ্রসঙ্গীত*। ষষ্ঠ সংস্করণ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৮।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *জীবনস্মৃতি, রচনাবলী ১৭*। কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮৪।

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। *রবীন্দ্রজীবনী*, প্রথম খণ্ড। ষষ্ঠ সংস্করণ। কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১৭।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান। রায়, আলপনা সম্পাদিত ও সংকলিত। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭।

সেনগুপ্ত, প্রবীর। *বাংলার গান বাংলাগান*। ড. অরুণ সরকার সম্পাদিত। কলকাতা, পুস্তক বিপনি, ২০০০।

হোসেন, মীর মোশাররফ। *বিষাদ সিন্ধু*। শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত। প্রথম সস্করণ। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৯।

Web Source:

https://sanatandharmatattva.wordpress.com/2018/04/17